সংবাদপত্রের নির্বাচিত রিপোর্ট: সারসংক্ষেপ

নিয়মিত বিভাগ হিসেবে এই পাতায় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ খবর বা প্রতিবেদনের নির্বাচিত অংশ এখানে প্রকাশিত হবে। - সম্পাদনা পরিষদ

ক্যানসারের প্রকোপ বেশি, চিকিৎসা অপ্রতুল
প্রথম আলো, ৭ নভেম্বর, ২০১৫

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যানসার রেডিয়েশন থেরাপির যন্ত্র দেড় মাস নষ্ট। জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে উপচে পড়া রোগীর ভিড়। তবে এ প্রতিষ্ঠানের অবস্থাও নাজুক, রেডিয়েশন থেরাপির ছয়টি যন্ত্রের তিনটিই নষ্ট। বাংলাদেশ ক্যানসার সোসাইটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। এর সঙ্গে প্রতিবছর নতুন করে যুক্ত হচ্ছে আড়াই লাখ রোগী। আর বছরে মারা যাচ্ছে দেড় লাখ মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) বলছে, আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ও রোগের প্রকোপের বিবেচনায় দেশে কমপক্ষে ১৬০টি ক্যানসার চিকিৎসাকেন্দ্র বা হাসপাতাল থাকা দরকার। তবে দেশে ক্যানসার চিকিৎসার সুযোগ খুবই সীমিত। সরকারি পর্যায়ে ১৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, জাতীয় ক্যানসার ইনস্টিটিউট ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ক্যানসার চিকিৎসায় কেমোথেরাপি (ওষুধে চিকিৎসা) দেওয়া হয়। তবে জাতীয় ক্যানসার ইনস্টিটিউটের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অধ্যাপক বলেছেন, সঠিক কেমোথেরাপি দিতে পারেন মেডিকেল অনকোলজিস্ট। কিন্তু সব প্রতিষ্ঠানে মেডিকেল অনকোলজিস্ট নেই। অন্যরা এই চিকিৎসা দিচ্ছেন। সরকারি পর্যায়ে জাতীয় ক্যানসার ইনস্টিটিউট ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই শুধু বিকিরণ চিকিৎসা চালু আছে। চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও রংপুর মেডিকেল কলেজ, সিলেট এম এ জি ওসমানী ও বরিশালের শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিকিরণ চিকিৎসার যন্ত্র নষ্ট। এর বাইরে ১০টি বেসরকারি হাসপাতাল ও কেন্দ্রে ক্যানসার চিকিৎসা ও সেবা দেওয়া হয়। কিন্তু এসব হাসপাতালে ব্যয় বেশি। সরকারি হাসপাতালে স্তন ক্যানসারে ১৬টি রেডিয়েশন থেরাপি দিতে খরচ পড়ে ১৪ হাজার ২০০ টাকা, বেসরকারি হাসপাতালে খরচ পড়ে দেড় লাখ থেকে তিন লাখ টাকা। অন্যান্য ক্যানসারের চিকিৎসায়ও খরচের পার্থক্য ব্যাপক।

সিইটিপিগুলোর পরিশোধিত বর্জ্যেই মিলছে দূষণ
বণিক বার্তা, ৭ নভেম্বর, ২০১৫

শিল্প-কারখানাগুলোয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপন করা হচ্ছে না। যে কারখানাগুলোয় ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে, অধিকাংশ সময়ই খরচ বাঁচাতে তা বন্ধ রাখা হচ্ছে। এ অবস্থায় তরল বর্জ্য পরিশোধন নিশ্চিত করতে রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাগুলোয় (ইপিজেড) কেন্দ্রীয়ভাবে ইটিপি স্থাপন করা হলেও সেগুলোর পরিশোধিত বর্জ্যে বিওডি ও সিওডির মাত্রা পাওয়া যাচ্ছে অনেক বেশি। শুধু তা-ই নয়, শোধন না করেই দূষিত বর্জ্য সরাসরি ফেলা হয়েছে নদী, জলাশয়ে। এতে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি উপেক্ষিতই থাকছে। উল্লেখ্য, গত বছরই বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের কাছ থেকে সাউথইস্ট ব্যাংক, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের যৌথভাবে দেয়া গ্রিন অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেছিল চিটাগং ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট লিমিটেড। বিশেষজ্ঞরা জানান, কল-কারখানার দূষিত বর্জ্য আশপাশের পরিবেশে মিশে জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের ভীষণ ক্ষতি করছে। নানা সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশে। কৃষিজমি হারাচ্ছে উর্বরা শক্তি। এটি যদি রোধ না করা যায়, তাহলে কারখানার উৎপাদনে যতটা উন্নয়ন হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি অনুন্নয়ন হবে এর অপরিশোধিত বর্জ্যে।

বিআইডিএসের গবেষণার তথ্য: কর্মসংস্থান ও কৃষি মজুরি
প্রথম আলো, ৬ নভেম্বর, ২০১৫

কর্মসংস্থান ও শ্রমবাজার নিয়ে বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক রুশিদান ইসলাম রহমান পরিচালিত গবেষণায় বলা হয়েছে, কৃষি খাতে প্রকৃত মজুরি বাড়লেও তা দিয়ে আগের চেয়ে কম চাল কেনা যায়। ২০১২ সালে এ খাতে একজন পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক দৃশ্যমান (নমিনাল) আয় ছিল ২৬০ টাকা। এ টাকা দিয়ে তখন ৮ দশমিক ৩২ কেজি চাল কেনা যেত। পরের তিন বছরে মজুরি বেড়েছে। কিন্তু আগের পরিমাণ চাল কেনা যায় না। ২০১৫ সালে একজন কৃষিশ্রমিকের দৈনিক মজুরি ২৯২ টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ টাকা দিয়ে মাত্র ৬ কেজি ৭১০ গ্রাম চাল কেনা যায়। গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশে যত কর্মসংস্থান হয়, এর ৭৯ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে। ২০১৩ সালের হিসাবে দেশে অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) খাতে ৪ কোটি ৬১ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। আর আনুষ্ঠানিক খাতে ১ কোটি ২০ লাখ। তবে ২০১০ সালের তুলনায় অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান কমেছে। তখন এ খাতে কর্মসংস্থানের হার ছিল সাড়ে ৮৭ শতাংশ।

পৌরসভার অর্থায়ন নিয়ে একটি গবেষণা করেছেন বিআইডিএসের জ্যেষ্ঠ গবেষক মোহাম্মদ ইউনূস ও সুলতান হাফিজ রহমান। এতে উঠে এসেছে, অধিকাংশ পৌরসভাই রাজনৈতিক বিবেচনায় গঠন করা হয়। ইউনিয়ন থেকে পৌরসভা গঠনের পর নাগরিকদের বাড়ির কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) বাড়ে, তবে সেবা বাড়ে না। এ ছাড়া ৯০ শতাংশ বাড়ির করই অদক্ষতা ও দুর্নীতির কারণে আদায় হয় না।

বাংলাদেশী শ্রমিক: বর্ণিল সিঙ্গাপুরে বিবর্ণ জীবন
বণিক বার্তা, ৬ নভেম্বর, ২০১৫

সিঙ্গাপুরে কর্মরত ৫০০ বাংলাদেশী শ্রমিকের খাবারের মান নিয়ে গবেষণা চালিয়েছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর। টানা দুই বছর শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার, খাবার তৈরির স্থান, খাবারের প্যাকেজিং, সরবরাহ ও পরিবেশিত খাবার পরীক্ষা করে গবেষণায় দেখানো হয়েছে, সেখানে প্রতি ১০ জন শ্রমিকের নয়জনই অস্বাস্থ্যকর খাবার খাচ্ছেন। আর এসব খাবার সরবরাহ করছে মালিকের পছন্দের ক্যাটারিং সার্ভিসগুলো।

গবেষণার ফলাফল বলছে, ক্যাটারিংয়ের খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন দেশটিতে কর্মরত ৮৬ শতাংশ প্রবাসী শ্রমিক। ৯৩ শতাংশ শ্রমিক পাচ্ছেন অপরিচ্ছন্ন খাবার। আর অস্বাস্থ্যকর খাবার খাচ্ছেন ৯৪ শতাংশ শ্রমিক। গতকাল টেলিফোনে কথা হয় নির্মাণ শ্রমিক নজরুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি বলেন, সিঙ্গাপুরের বাইরেটা যত ঝকঝকে, ভেতরটা সে রকম নয়। শ্রমিকদের পদে পদে বঞ্চিত করা হয়। মাসে খাওয়ার জন্য ৭ হাজার টাকা কোম্পানি কেটে রাখে। এ টাকায় অনেক ভালো মানের খাবার পাওয়ার কথা। অথচ খেতে হচ্ছে বাসি, পচা আর অস্বাস্থ্যকর খাবার।

তিনি বলেন, শ্রমিকরা ইচ্ছা করলেও নিজের পছন্দমতো রান্না করে খাবার খেতে পারেন না। সারা দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর চাইলেও রান্না করা সম্ভব নয়। তাই ক্যাটারিংয়ে যা পাওয়া যায়, তা-ই খেতে হয়। মন না চাইলেও বাধ্য হয়ে এটি খেতে হয় তাদের। জাহাজ নির্মাণ শ্রমিকরা জানান, তারা কখনো দিনের আলো দেখতে পারেন না। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সবকিছু হয় কাজের সময়। প্রতিদিন ভোর সাড়ে ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত তারা ব্যস্ত থাকেন। ভোর সাড়ে ৪টায় কাজের উদ্দেশ্যে লরিতে উঠতে হয়। সকাল ৫টায় ইয়ার্ডে পৌঁছার পর কাজ শুরু হয়। শেষ হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। আবার লরিতে করে বাসায় ফিরতে বেজে যায় সন্ধ্যা ৭টা। এত পরিশ্রম সত্ত্বেও ন্যায্য মজুরি পাচ্ছেন না তারা। সপ্তাহে ৬৫-৭০ ঘণ্টা কাজ করেও প্রতি মাসে তারা দেশে পাঠাতে পারছেন ১৫ হাজার টাকা।

অর্থ চীনের, ঠিকাদারও ঠিক করে দেয় চীন
প্রথম আলো, ৮ নভেম্বর, ২০১৫

চীনের দেওয়া ঋণের অর্থে কোনো প্রকল্প নেওয়া হলে চীনের ঠিকাদার নিয়োগ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে দরপত্র আহ্বানও করা হয় না। এটাই অলিখিত শর্ত। চীন

সরকারই এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করে দেয়। দরপত্র আহ্বান করে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয় না। আবার পণ্য ও সেবা কেনার ক্ষেত্রে শুধু চীন থেকেই নেওয়া হয়। সম্প্রতি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) তৈরি করা একটি প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে।

বর্তমানে চীনের অর্থায়নে চারটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। প্রকল্পগুলো হলো থ্রিজি প্রচলন, শাহজালাল সার কারখানা নির্মাণ, পদ্মা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ইনফো সরকার। এসব প্রকল্পে ৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকার বেশি ঋণ দিচ্ছে চীন। এ ছাড়া দাশেরকান্দি পয়োশোধনাগার এবং ফোর টায়ার-জাতীয় ডেটা সেন্টার প্রকল্পেও চীন অর্থ দেবে। এ দুটি প্রকল্প ইতিমধ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ দুটি প্রকল্পে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা দেবে চীনের এক্সিম ব্যাংক।

চীনের দেওয়া ঋণের অন্যতম শর্ত হলো, চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যদিকে শর্তানুযায়ী, চীনের অর্থায়নের প্রকল্পে পণ্য ও সেবাও কিনতে হয় চীন থেকে। ভারতীয় ১০০ কোটি ডলারের ঋণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

২৪৩ পোশাক কারখানায় নিরাপত্তা ঝুঁকি আছে

প্রথম আলো, ১০ নভেম্বর, ২০১৫

১ হাজার ৩৫৪টি তৈরি পোশাক কারখানার মধ্যে ২৪৩টিতে নিরাপত্তাঝুঁকি আছে। এসব কারখানা ভবনের কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক ও অগ্নিসংক্রান্ত বিভিন্ন ছোট-বড় ত্রুটি আছে। জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনার (এনটিএপি) অধীনে তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শনের প্রাথমিক কার্যক্রম শেষ করেছে সরকার। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সহায়তায় শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) কার্যক্রমটি পরিচালনা করছে। রাজধানীতে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে গতকাল এক সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, অধিদপ্তর ১ হাজার ৪৭৫টি পোশাক কারখানার পরিদর্শন শেষ করেছে। এর মধ্যে ১ হাজার ৩৫৪ কারখানার পরিদর্শন প্রতিবেদন বিশ্লেষণে ১৯ শতাংশ বা ২৪৩ কারখানায় ত্রুটি পাওয়া যায়। এর মধ্যে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ 'রেড' ক্যাটাগরির ১৬ কারখানা রিভিউ প্যানেলে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তিনটি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কারখানাগুলো হচ্ছে হেমা সোয়েটার, দোয়েল ফ্যাশন ও ইমিরাল ফ্যাশন। এখানে কাজ করতেন ৮৪৬ জন পোশাকশ্রমিক। এ ছাড়া ত্রুটিযুক্ত ২০৯ কারখানার ডিটেইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্ট (ডিইএ) করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় এই উদ্যোগটি ছাড়াও ইউরোপীয় ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার ক্রেতাদের জোট অ্যালায়েন্স কারখানা পরিদর্শন করছে। অধিদপ্তরের হিসাবে, দুই জোট ২ হাজার ১৮৫টি কারখানা পরিদর্শন করেছে। তুলনামূলকভাবে ভালো এই কারখানা বিশ্বের বড় ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করে। অন্যদিকে অধিদপ্তরের পরিদর্শন করা কারখানাগুলো রপ্তানি করে না। অন্য কারখানার ঠিকা কাজের (সাব-কন্ট্রাক্টিং) ভিত্তিতে এগুলোর উৎপাদন চলে। দুই জোটের পরিদর্শনে ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা হিসেবে ৩৪টি বন্ধ হয়েছে। তবে অধিদপ্তরের পরিদর্শনে বন্ধ হয়েছে মাত্র তিনটি। অধিদপ্তর কেবল তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের দুই সংগঠন-বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর সদস্যভুক্ত কারখানা পরিদর্শন করেছে। দুই সংগঠনের বাইরেও কয়েক শ কারখানা রয়ে গেছে।

নৌপথে ভারতীয় পণ্য পরিবহন: প্রতি টনে মাশুল ১৩০ টাকা করার প্রস্তাব ঢাকার

প্রথম আলো, ১৬ নভেম্বর, ২০১৫

নৌ প্রটোকলের আওতায় বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারতীয় পণ্য পরিবহনে প্রতি মেট্রিক টনের ট্রানজিট মাশুল হিসেবে ১৩০ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। এর বাইরে যদি নিরাপত্তা প্রহরা বা এসকর্ট চায়, তাহলে আরও ৫০ টাকা দিতে হবে। ২০১২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এ মাশুল প্রতি টনে ৫৮০ টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। এদিকে গতকাল দিল্লিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সমুদ্র পরিবহন-সংক্রান্ত কার্যপ্রণালি পদ্ধতি (এসওপি) সই হয়েছে। এর ফলে ভারতের পূর্ব উপকূলীয় বন্দরগুলো থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা বন্দরে সরাসরি পণ্য আদান-প্রদান করা যাবে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো মোহাম্মদ ইউনুস এ ব্যাপারে বলেন, 'আমরা নৌ ট্রানজিট নিয়ে যে গবেষণা করেছি, তাতে প্রতি টনের জন্য ১৩০ টাকা ধার্য করা বাংলাদেশের জন্য লাভজনক হয় না। মাশুল আরও অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল। এ ছাড়া ওই নৌপথের জন্য ভারত কত টাকা বিনিয়োগ করবে, সেই বিষয়টিও চুক্তিতে না থাকলে এই চুক্তি থেকে বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক হবে না।' ভারতকে ট্রানজিট-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে ফি কত হবে, তা নির্ধারণে ২০১১ সালে গঠন করা হয় কোর কমিটি। ২০১২ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কোর কমিটির কাছে প্রতি টনে ৫৮০ টাকা ফি আদায়ের প্রস্তাব দেয়। এর মধ্যে স্ক্যানিংয়ের জন্য ৩০০ টাকা, ট্রানশিপমেন্ট বাবদ ২০ টাকা এবং নথি প্রক্রিয়াকরণ বাবদ ১০ টাকাসহ আটটি খাতে এ টাকা ধরা হয়। এ ছাড়া পণ্যের বিপরীতে ব্যাংক গ্যারান্টি দেওয়ার কথা বলা হয়।

দোহাজারী-গুনধুম রেলপথ নির্মাণে অস্বাভাবিক ব্যয় প্রস্তাব

বণিক বার্তা, ১৫ নভেম্বর ২০১৫

ভারতে প্রতি কিলোমিটার সাধারণ রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হয় ১২-১৭ কোটি টাকা। পাকিস্তানে এ ধরনের রেলপথের নির্মাণ ব্যয় ১২-১৫ কোটি টাকা। অথচ বাংলাদেশে দোহাজারী-কক্সবাজার-গুনধুম রেলপথ নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় ধরা হয়েছে ১০১ কোটি ৭৯ লাখ টাকা। এ ব্যয় চীনের হাইস্পিড রেলপথ নির্মাণ ব্যয়ের চেয়েও বেশি। দেশটিতে ঘণ্টায় ২০০ কিলোমিটার গতির হাইস্পিড রেলপথ নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি গড় ব্যয় হয় ৭৩-৭৫ কোটি টাকা।

শুধু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই নয়, দেশীয় অন্য প্রকল্পের চেয়েও দ্বিগুণের বেশি ব্যয় ধরা হয়েছে দোহাজারী-কক্সবাজার-গুনধুম রেলপথ নির্মাণে। জানা গেছে, গত ফেব্রুয়ারিতে ভারতের রেল ব্যবস্থার ওপর এক শ্বেতপত্র (হোয়াইট পেপার) প্রকাশ করে দেশটির রেলপথ মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, আগামী কয়েক বছরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১৫৪টি নতুন রেলপথ নির্মাণ করা হবে। এগুলোর মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৭ হাজার ১০৫ কিলোমিটার। এজন্য ১ লাখ ৭৩ হাজার ৪৪৮ কোটি রুপি ব্যয় হবে। অর্থাৎ কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় পড়বে ১০ কোটি ১৪ লাখ রুপি বা প্রায় ১২ কোটি টাকা।

এদিকে ভারতের মুম্বাই শহর থেকে আহমেদাবাদ পর্যন্ত ৫৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ হাইস্পিড রেলপথ নির্মাণ করা হবে। এক্ষেত্রে ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৩ হাজার ১৮০ কোটি টাকা। এতে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় হবে ১১৮ কোটি টাকা। পাকিস্তানে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে খানেওয়াল থেকে রায়উইন্ড পর্যন্ত ২৪৬ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করা হয়। এতে ব্যয় করা হয়েছে ৪ হাজার কোটি পাকিস্তানি রুপি বা ৩ হাজার কোটি টাকা। এতে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় পড়েছে ১২ কোটি ১৯ লাখ টাকা। দেশটির পরিকল্পনা কমিশনের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। চীনে হাইস্পিড রেলপথের নির্মাণ ব্যয় অনেক কম। গত বছর বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। এতে বলা হয়, দেশটি ঘণ্টায় ৩৫০ কিলোমিটার গতির ট্রেন চালানোয় রেলপথ নির্মাণে অনেক কম ব্যয় করছে। এক্ষেত্রে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় হচ্ছে দেড়-দুই কোটি ডলার। আর ২০০ কিলোমিটার গতির রেললাইন নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে গড়ে ৯০-৯২ লাখ ডলার বা ৭৩-৭৫ কোটি টাকা। আর দেশটি ২০১০ সালে সর্বশেষ সাধারণ রেলপথ নির্মাণ করে। তাতে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় হয়েছিল ১৬ লাখ ডলার বা সাড়ে ১২ কোটি টাকা।

অ্যাকর্ডের প্রতিবেদন: ত্রুটি সংশোধনে পিছিয়ে ১ হাজার পোশাক কারখানা

বণিক বার্তা, ১৫ নভেম্বর ২০১৫

নির্ধারিত সময়ে দেশের পোশাক কারখানাগুলোর ত্রুটি সংশোধনে বারবার তাগাদা দেয়া হলেও সময়মতো ত্রুটি সংশোধনে পিছিয়ে আছে ১ হাজার ৪টি পোশাক কারখানা। শিল্প মূল্যায়নে নিয়োজিত ইউরোপীয় ক্রেতাজোট অ্যাকর্ড অন বিল্ডিং অ্যান্ড ফায়ার সেফটি ইন বাংলাদেশের (অ্যাকর্ড) প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে। চলতি মাসে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে অ্যাকর্ড।

অ্যাকর্ডের তালিকাভুক্ত পোশাক কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ৬০০-এরও বেশি। এর মধ্যে গত আগস্ট পর্যন্ত ১ হাজার ২৮৯টি কারখানা পরিদর্শন করেছেন অ্যাকর্ডের প্রকৌশলীরা। পরিদর্শনের পর সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (সিএপি) পেয়েছে, এমন কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ১৬০। এর মধ্যে ১ হাজার ৪টি কারখানাই বেঁধে দেয়া সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি বলে অ্যাকর্ডের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রাথমিক পরিদর্শনের পর ফলো-আপ পরিদর্শন হয়েছে, এমন কারখানার সংখ্যা ১ হাজার ৪৯৪। অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও স্থাপত্যসংক্রান্ত সিএপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন এ কারখানাগুলোয়; যার মধ্যে ১ হাজার ৪টির সিএপি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন থাকলেও তা সময় অনুযায়ী সম্পন্ন হয়নি। এর কোনো যৌক্তিক কারণও দেখাতে পারেনি সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলো। অ্যাকর্ডের তালিকাভুক্ত কারখানাগুলোয় অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও স্থাপত্য সমস্যার সংখ্যা মোট ৬৭ হাজার ২২৮, অগ্নি সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে ২৩ হাজার ৪৩৬টি। সংশোধন অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে অ্যাকর্ডের আর্টিকেল ২১ অনুযায়ী ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করারও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে প্রান্তিক প্রতিবেদনে। এদিকে তিনটি কারখানার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সমাপ্তি টানার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এগুলো হলো সাদাফ ফ্যাশনস লিমিটেড, মেসার্স মেগা চয়েজ নিটওয়্যার লিমিটেড ও ফ্লোরেন্স ফ্যাশনস লিমিটেড। এ ঘোষণা অনুযায়ী ২০ দেশের ২০০-এরও বেশি ক্রেতার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছেদ হচ্ছে পোশাক উৎপাদন ও সরবরাহকারী এ তিন কারখানার।

ভারতের সঙ্গে ট্রানজিট: বাংলাদেশ পাচ্ছে কম, দিচ্ছে বেশি

প্রথম আলো, ১৮ নভেম্বর, ২০১৫

ট্রানজিটে বাংলাদেশ পাচ্ছে কম, দিচ্ছে বেশি। ট্রানজিটে সবচেয়ে লাভবান হবে ভারত, আর সামান্য আয় হবে বাংলাদেশের। ট্রানজিটের জন্য অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয়ও বেশি করতে হবে বাংলাদেশকে। চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সড়কপথে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা থেকে ঢাকা হয়ে ত্রিপুরার আগরতলায় পণ্যের একটি চালান গেছে। এটি ছিল সড়কপথের পরীক্ষামূলক ট্রানজিট। বাংলাদেশ এই সুযোগ না দিলে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি, আসাম, মেঘালয়, করিমগঞ্জ হয়ে আগরতলায় যেতে সড়কপথে পাড়ি দিতে হতো ১ হাজার ৫৬০ কিলোমিটার পথ। আর এ জন্য সময় লাগে আট দিন বা ১৯২ ঘণ্টা। কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা পথে যেতে সেই দূরত্ব এক হাজার কিলোমিটার কমে হয়েছে ৫৫৯ কিলোমিটার। চালানটি গেছে মাত্র ৫১ ঘণ্টায়। পরীক্ষামূলক বলেই ভারত এ জন্য প্রতীকী মাশুল দিয়েছে এক টাকা।

সড়কপথে ট্রানজিট মাশুল কত হবে, তা এখনো ঠিক হয়নি। গত সোমবার দিল্লিতে নৌ-ট্রানজিটের মাশুল চূড়ান্ত হয়েছে মাত্র ১৯২ টাকা ২২ পয়সা। এর মধ্যে শুল্ক বিভাগের জন্য ১৩০ টাকা, প্রতি কিলোমিটার সড়ক পরিবহনে ১ টাকা ২ পয়সা ও নৌবন্দর সুবিধায় ১০ টাকা রয়েছে। শিগগিরই বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল ও ভারতের মধ্যে যান চলাচল চুক্তির আওতায় মাশুল নির্ধারণ করা হবে, যা সড়কপথে ট্রানজিট হিসেবে পরিচিত। সেখানে নৌ-প্রটোকলের সড়ক অংশের ট্রানজিট মাশুলকেই ভিত্তি ধরা হতে পারে। ট্রানজিট নিয়ে সরকার ২০১১ সালে একটি কোর কমিটি গঠন করেছিল। ট্যারিফ কমিশনের সেই সময়ের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান ছিলেন কমিটির প্রধান। বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞরাও সেই কমিটিতে ছিলেন। কমিটি একটি সমন্বিত ট্রানজিটের জন্য ১৫ ধরনের মাশুল আরোপের সুপারিশ করেছিল। কমিটির অন্যতম সুপারিশ ছিল, কেবল জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) শুল্ক বিভাগের মাশুলই হবে সর্বনিম্ন ৫৮০ টাকা। কোর কমিটি আরও বলেছিল, ট্রানজিট দিতে বাংলাদেশকে যে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে, তাতে বিনিয়োগই করতে হবে ৪৭ হাজার কোটি টাকা। সেই কোর কমিটি নেই। বিনিয়োগ উঠিয়ে আনা নিয়েও কোনো আলোচনা নেই। কোর কমিটির সেই প্রতিবেদনও এখন হিমঘরে। আর ৫৮০ টাকার মাশুল কমতে কমতে হয়ে গেছে ১৩০ টাকা। তবে সংশ্লিষ্ট একজন সরকারি কর্মকর্তা বলেছেন, বাংলাদেশ যে কম হলেও মাশুল আদায় করতে পারছে, এটাই বড় সাফল্য। কারণ, একসময় সরকারের কেউ কেউ বলেছিলেন, কোনো মাশুলই আরোপ করা যাবে না।

বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ ব্যবস্থাপনায় যাচ্ছে সুন্দরবন

কালের কণ্ঠ, ১৮ নভেম্বর, ২০১৫

বাংলাদেশ অংশের ছয় হাজার বর্গকিলোমিটার আর ভারত অংশের চার হাজার বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এলাকাজুড়ে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ও এর স্বকীয়তা রক্ষায় যৌথভাবে কাজ শুরু করেছে দুই দেশ। বাংলাদেশ ও ভারত অংশের সুন্দরবনকে একীভূত করে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান আর উন্নয়ন হবে অভিন্ন ব্যবস্থাপনায়। গোটা সুন্দরবনের উন্নয়ন, নজরদারি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালিত হবে নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে। সুন্দরবন যৌথ ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে এরই মধ্যে দুই দেশ তিন দফা বৈঠক করেছে। আজ আবার তারা একসঙ্গে বসছে।

ভারতের মতো বাংলাদেশ অংশে চালু হবে ইকো-সিস্টেম ও ইকো-ট্যুরিজম। তবে পর্যটক যাতায়াতে আসবে নিয়ন্ত্রণ। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং সুপেয় পানি নেওয়া ও সংরক্ষণের জন্য চলছে নতুন কর্মপরিকল্পনা। বাংলাদেশ-ভারত সুন্দরবন রিজিওন কো-অপারেশন ইনিশিয়েটিভ (এসআরসিআই) প্রকল্পের আওতায় এসব কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। দুই দেশের নীতিনির্ধারকরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হুমকির মধ্যে থাকা বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনকে বাঁচাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের যৌথ ইশতেহারের আলোকে সুন্দরবনের দুই অংশকে একসঙ্গে উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তাঁরা।

সুন্দরবনকে একীভূত করে এর সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কৌশল নিয়ে কাজ করছে দুই দেশের বেসরকারি খাত। বাংলাদেশ অংশে সুন্দরবন নিয়ে কাজ করছে বিশ্বব্যাংক, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (পিআরআই) ও ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাসোসিয়েশন (আইডাব্লিউএ)। আর ভারতের অংশের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে কাজ করছে সে দেশের সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ড, গবেষণা সংস্থা অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন (ওআরএফ) ইনস্টিটিউট ফর ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালাইসিসসহ (আইডিএসএ) অন্যরা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঢাকা সফরের পর থেকে সুন্দরবনকে একীভূত ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিয়ে ঢাকা ও দিল্লিতে দুই দেশের মধ্যে তিনবার বৈঠক হয়েছে। ভারতের অংশে সুন্দরবন পরিচালনার জন্য আছে সে দেশের পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ড। আর বাংলাদেশে সুন্দরবনের দায়িত্বে আছে বন বিভাগ। এ ছাড়া জমির মালিক ডিসি। এ জন্য দুই দেশের ব্যবস্থাপনাও ভিন্ন। প্রথমত, দুই দেশের ব্যবস্থাপনাকে একীভূত করা হবে। এ ছাড়া ভারত অংশে যেভাবে ইকো-সিস্টেম ও ইকো-ট্যুরিজম গড়ে তোলা হয়েছে, বাংলাদেশেও ঠিক একই প্রক্রিয়ায় সুন্দরবনে ইকো-সিস্টেম ও ইকো-ট্যুরিজম গড়ে তোলা হবে। একই সঙ্গে সুন্দরবনে থাকা জীববৈচিত্র্যকে সুরক্ষা দেওয়া এবং সেখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী যারা সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থা করে দেওয়ার কর্মপরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। পর্যটকরা নির্দিষ্ট একটি স্থান পর্যন্ত যেতে পারবে। এর ভেতরে যেতে পারবে না। এমন পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে। মধু আহরণ, গোলপাতা সংগ্রহের মতো বিষয়গুলো নিজ নিজ অঞ্চলের আওতায় রাখার চিন্তা আছে।

কর্ণফুলীর তলদেশে টানেল: নির্মাণ শুরুর আগেই দুই দফায় ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি

বণিক বার্তা, ১৭ নভেম্বর ২০১৫

চীনের অর্থায়নে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মাণ করা হবে টানেল। বায়ার্স ক্রেডিটের (কঠিন শর্তের ঋণ) আওতায় এটি নির্মাণ করবে চায়না কমিউনিকেশন কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (সিসিসিসি)। প্রকল্পটির নির্মাণকাজ এখনো শুরু না হলেও এরই মধ্যে দুই দফায় প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে ব্যয়। মূলত অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটায় এ ব্যয় বাড়ছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। সম্প্রতি প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে সেতু বিভাগ।

দেশের প্রথম টানেল নির্মাণে গত ডিসেম্বরে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি)

চূড়ান্ত করা হয়। তখন টানেল নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় ৫ হাজার ৬০০ কোটি ৪০ লাখ টাকা। অর্থায়নের নিশ্চয়তা না থাকায় সে সময় তা ফেরত দেয় পরিকল্পনা কমিশন। পরে সিসিসিসির সঙ্গে চুক্তি করে সেতু বিভাগ। প্রতিষ্ঠানটির প্রস্তাবনার ভিত্তিতে গত জুনে প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ৭ হাজার ৭৮৪ কোটি ৬ লাখ টাকা। তবে সিসিসিসির কিছু প্রস্তাবে আপত্তি তোলে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)। চলতি মাসে প্রকল্পটি আবার অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়েছে সেতু কর্তৃপক্ষ। এতে ব্যয় না কমে উল্টো বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৪৪৬ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। অর্থাৎ নির্মাণ শুরুর আগেই দুই দফায় ব্যয় বেড়েছে ২ হাজার ৮৪৬ কোটি ২৪ লাখ টাকা।

উল্লেখ্য, ব্যয় বৃদ্ধির বড় অংশই সরকারি তহবিল থেকে বহন করতে হচ্ছে। জানা গেছে, প্রকল্পটির আওতায় নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২টি গাড়ি কেনায় ১০ কোটি ও সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণে ৬ কোটি টাকা ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে। এর পুরোটাই চীনের ঋণে বহন করা হবে। এর বাইরে প্রকল্প অফিস নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, গাড়িচালকদের বেতন ও গাড়ি রাখার শেড নির্মাণ, বিনোদন বাবদ ব্যয়, গৃহকর্মীদের বেতন, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়, পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ বিলসহ সব ধরনের ব্যয় চীনের বায়ার্স ক্রেডিটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এসব ব্যয়ের অর্থ সরকারকে সুদসহ পরিশোধ করতে হবে। উল্লেখ্য, টানেল নির্মাণে ৬৫ কোটি ডলার বায়ার্স ক্রেডিট দেবে চীন। এক্ষেত্রে সুদের হার প্রস্তাব করা হয়েছে ২ শতাংশ। এছাড়া দশমিক ২ শতাংশ কমিটমেন্ট ফি ও দশমিক ২ শতাংশ ম্যানেজমেন্ট ফি এককালীন পরিশোধ করতে হবে। আর গ্যারান্টি ও অন্যান্য ফি মিলে প্রায় ৪ শতাংশের ওপরে সুদ পরিশোধ করতে হবে বাংলাদেশকে। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০ বছর, যার মধ্যে পাঁচ বছর গ্রেস পিরিয়ড। এতে নির্মাণকালীন সুদ পরিশোধ বাবদ প্রায় ৪২৯ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

আরও ৭৬ হাজার কোটি টাকা পাচার
প্রথম আলো, ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫

বাংলাদেশ থেকে ২০১৩ সালে আরও ৯৬৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার পাচার হয়েছে। টাকার অঙ্কে যা ৭৬ হাজার ৩৬১ কোটি ৪০ লাখ টাকা। পাচার হওয়া এই অর্থ আগের বছরের তুলনায় ৩৩ দশমিক ৭৯ শতাংশ বেশি। ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই) গতকাল অর্থ পাচারের এই তথ্য প্রকাশ করেছে। জিএফআই সাত বছর ধরে উন্নয়নশীল দেশ থেকে কী পরিমাণ অর্থ অবৈধভাবে পাচার হয়, তা নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। এবার 'উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে অবৈধ অর্থের প্রবাহ ২০০৪-১৩' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মূলত আমদানি-রপ্তানির সময়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন করার মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া ওই অর্থ বাংলাদেশের ২০১৫-১৬ অর্থবছরের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, পল্লী উন্নয়ন, শিল্প ও ভৌত অবকাঠামো খাতের মোট উন্নয়ন বাজেটের সমান। সব মিলিয়ে ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের পরিমাণ ৫ হাজার ৫৮৭ কোটি ৭০ লাখ ডলার বা ৪ লাখ ৪১ হাজার ৪২৪ কোটি টাকা। এই অর্থ দিয়ে অন্তত দুই বছরের বাজেট তৈরি করতে পারত বাংলাদেশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গড়ে প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে ৫৫৮ কোটি ৮০ লাখ ডলার। গবেষণায় মূলত দুভাবে অর্থ পাচারের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে ট্রেড মিসইনভয়েসিং বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চালানের গরমিলের মাধ্যমেই বেশি পরিমাণ অর্থ উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে পাচার হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ পণ্য আমদানি-রপ্তানির চালানে প্রকৃত মূল্য আড়াল করে কমবেশি দেখিয়ে একদিকে কর ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে মোটা অঙ্কের অর্থ দেশে না এনে বাইরেই রেখে দেওয়া হয়েছে। অপরটি হলো আন্তর্জাতিক লেনদেনে গরমিল, তবে এর মধ্যে ভুয়া চালান দেখিয়েই অর্থের ৮৩ শতাংশ পাচার করা হয়েছে।

রিকশা চালিয়ে লেখাপড়ার খরচ যোগান রাবি ছাত্র রিপন
ইত্তেফাক, ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫ ইং

রাজধানীতে রাতে রিকশা চালান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ছাত্র মোহাম্মদ রিপন আলী! একদিন রিকশা চালালে তার ৭/৮শ' টাকা রোজগার হয়। তবে তিনি মাসে মাত্র ১০ দিন রিকশা চালান। এতে তার ৪ হাজার টাকা আয় হয়। আর তা নিয়েই রিপন চলে যান রাজশাহীতে। মাসের বাকি ২০ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পড়াশুনায় ব্যয় করেন হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় সেমিস্টারের এই শিক্ষার্থী। মূলত পড়ালেখা ও সংসারের খরচ জোগাতেই খণ্ডকালীন রিকশাচালক হতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। রিপন আলীর বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আলাইপুর গ্রামে। পিতার অবর্তমানে ১০-১২ বছর বয়স থেকেই মা ও এক বোনের ভরণপোষণের ভার নিজের কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে তাকে। বোন আঁখি স্থানীয় কেশরপুর হাইস্কুলের ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী। মা মাসুদা বেগম গ্রামে অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। দূর সম্পর্কের চাচা আকবর শেখের বাড়ির পাশে একটি কুঁড়েঘরে মা ও বোনকে নিয়ে বসবাস করেন রিপন। স্কুলে পড়ার সময় রিপন দিনমজুর হিসাবে কাজ করতেন। ২০১১ সালে কেশরপুর হাইস্কুল থেকে চার দশমিক ছাপান্ন গ্রেড পয়েন্ট নিয়ে বাণিজ্য বিভাগ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ২০১৩ সালে চার দশমিক আশি গ্রেড পয়েন্ট নিয়ে এইচএসসি উত্তীর্ণ হওয়ার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির সুযোগ পান।

দেশে শিশু শ্রমিক সাড়ে ৩৪ লাখ
সমকাল, ১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (আইএলও) গাইডলাইন অনুযায়ী পরিচালিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শিশুশ্রম জরিপ থেকে জানা গেছে, দেশের মোট শিশুর সংখ্যা তিন কোটি ৯৬ লাখ। এর মধ্যে সাড়ে ৩৪ লাখ শিশুশ্রমিক। বিবিএসের পরিচালক সুব্রত ঘোষ সমকালকে বলেন, প্রায় দশ বছর পর আইএলওর গাইডলাইন অনুযায়ী শিশুশ্রম জরিপটি করা হয়েছে। জরিপের প্রতিবেদনও চূড়ান্ত করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হবে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক দশক আগের জরিপে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩২ লাখ। যাদের বয়স পাঁচ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। ঢাকা বিভাগে রয়েছে সবচেয়ে বেশি প্রায় ১৪ লাখ শিশুশ্রমিক। এর পরই চট্টগ্রামের অবস্থান। রংপুরে বিভাগেও উল্লেখযোগ্য শিশুশ্রমিক রয়েছে। বরিশালে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে কম। এসব শিশু কাজ করছে মূলত পাঁচটি খাতে। এগুলো হলো- পরিবহন এবং গুদামজাতকরণ, পাইকারি এবং খুচরা ব্যবস্যা, যানবাহন মেরামত, নির্মাণ খাত এবং খনিজ খাত। বিবিএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর যন্ত্রপাতি, আগুন-গ্যাস, ধুলাবালি এবং ঝাঁকুনিপূর্ণ স্থান, প্রচণ্ড গরম এবং উত্তপ্ত, ভূগর্ভস্থ অথবা অতি উচ্চতায় অন্ধকার বা আবদ্ধ স্থানে পানি, রাসায়নিক ও বিস্ফোরক নিয়ে কাজ করার কারণে শিশুদের কর্মস্থল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সৌদি আরবের নতুন সামরিক জোটে বাংলাদেশ
বিবিসি বাংলা, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫

৩৪টি মুসলিম দেশ নিয়ে নতুন সামরিক জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ৩৪টি মুসলিম প্রধান দেশ নিয়ে একটি নতুন সামরিক জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। একটি সংবাদ সম্মেলনে সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী যুবরাজ মোহামেদ বিন সালমান বলেছেন, এই জোট ইরাক, সিরিয়া, মিশর আর আফগানিস্তানে সন্ত্রাসী ও চরমপন্থিদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। জোটের ৩৪টি দেশের তালিকাঃ
সৌদি আরব, বাহরাইন, বাংলাদেশ, বেনিন, চাদ, কোমোরোস, আইভরি কোস্ট, জিবুতি, মিশর, গ্যাবন, গায়েনা, জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মালি, মরক্কো, মৌরিতানিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিস্তান, কাতার, সেনেগাল, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সুদান, টোগো, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, আরব আমিরাত এবং ইয়েমেন।

ইন্টারন্যাশনাল লেবার রাইটস ফোরামের গবেষণা
পোশাকশ্রমিকদের ওপর নির্যাতন বন্ধে সবাই নীরব
প্রথম আলো, ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৫

সাভারের রানা প্লাজা ধসের পর দেশে তৈরি পোশাক খাতে কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কাজ চলছে। শ্রমিকেরা বলছেন, কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অধিকার যতক্ষণ প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁরা নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারছেন না। অনেক কারখানার শ্রমিকেরা এখনো ট্রেড ইউনিয়ন করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। কর্মপরিবেশ উন্নয়ন নিয়ে অনেক কথা হলেও শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের বিষয়ে সবাই নীরব।

ইন্টারন্যাশনাল লেবার রাইটস ফোরামের (আইএলআরএফ) 'আওয়ার ভয়েস, আওয়ার সেফটি' বা 'আমাদের কণ্ঠ, আমাদের নিরাপত্তা' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে এসেছে। দেশের বিভিন্ন এলাকার পোশাক কারখানার নারী ও পুরুষ শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনের নেতাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

সংস্থাটির সম্প্রতি প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কারখানায় বিদ্যুৎ, অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অবশ্যই জরুরি। কারণ এগুলো শ্রমিকদের জীবন বাঁচাতে সহায়ক। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের ভয়ভীতি ও নির্যাতন বন্ধে নীরবতা ভেঙে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শক্ত অবস্থান নেওয়াও প্রয়োজন। না হলে ঝুঁকি থেকেই যাবে।

রিনা হোসেন নামের এক অপারেটরের কাছে গবেষক দলের প্রশ্ন ছিল, গত এক বছরের চেয়ে আপনি এখন কতটা নিরাপদ। উত্তরে তিনি বলেন, '১০ শতাংশ উন্নতি হয়েছে। বাধাটা হচ্ছে, অধিকাংশ কারখানাতেই শ্রমিকদের চেয়ে কর্মকর্তা বেশি শক্তিশালী। আমি ঘণ্টায় ৬০-৭০ পিচ পোশাক সেলাই করতে পারি। কিন্তু তারা আমাকে দিয়ে ১২০ পিচ কাপড় সেলাই করাতে চায়। আমি বাথরুমে যেতে, পানি খেতে কিংবা বিশ্রাম নিতে চাই। কিন্তু পারি না।'

তবে অনেক শ্রমিকের বক্তব্যেই উঠে এসেছে যে তাঁদের জন্য সংগঠিত হওয়া কিংবা ট্রেড ইউনিয়ন করা খুবই কঠিন। এ সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়, ইউনিয়ন করতে গেলেই শ্রমিকেরা কারখানা কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূল হয়ে পড়েন। তাঁদের ওপর সব সময় মালিকপক্ষের লোকজনের নজরদারি থাকে এবং ছাঁটাইয়ের হুমকিসহ নানা ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের খড়গ নেমে আসে। তবে যাঁরা শেষ পর্যন্ত ইউনিয়ন করতে সক্ষম হন, তাঁদের দাবিদাওয়া আদায়টা অনেক সহজ হয়েছে।

নুরুল শের নামের এক শ্রমিক তাঁর কারখানার ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট। লেবার রাইটস ফোরামের গবেষকদের তিনি বলেন, 'ইউনিয়ন করা অতটা সহজ না। যখনই কারখানা কর্তৃপক্ষ জানল যে আমরা ইউনিয়ন করতে চাই, তখনই তারা নানা ধরনের নির্যাতন শুরু করল।' তিনি বলেন, 'আমি এক ঘণ্টায় জ্যাকেটের ৬০টি হাতা সেলাই করতে পারতাম। ইউনিয়ন করার কথা শুনে কারখানার কর্মকর্তারা আমাকে এক ঘণ্টায় ১২০টি করতে বলল। যখনই আমি সেটি না পারতাম, আমাকে চড়-থাপ্পড়, এমনকি বেঞ্চের ওপর কানে হাত ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখত।'

গবেষকেরা শ্রমিকদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন তাঁদের উন্নয়নে বড় বাঁধা কারা? এই প্রশ্নের উত্তরে সবিতা ব্যাপারী নামের এক নারী শ্রমিক বলেন, পুলিশ ও মালিকের গুন্ডারা। তারপর কারখানার ব্যবস্থাপক, পরিদর্শক ও লাইন চিফ। আরেক শ্রমিক রিতু খানও বলেন, পুলিশ, মালিকের গুন্ডা, ব্যবস্থাপক ও লাইন চিফই বড় সমস্যা। পুলিশের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, মালিক অনেক সময় শ্রমিকদের হয়রানি করতে পুলিশ নিয়ে আসেন।

পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে এক লাখ কোটি টাকার চুক্তি
কালের কণ্ঠ, ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৫

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে রাশান ফেডারেশনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান আতমস্ত্রয়িক্সপোর্ত এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের মধ্যে চুক্তিটি হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১২ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় এক লাখ এক হাজার কোটি টাকায় পাবনার রূপপুরে দুই হাজার ৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করবে রাশান ফেডারেশন। ভিভিইআর ১২০০ মডেলের কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। মোট ১২ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলারের চুক্তির মধ্যে বিদ্যুৎকেন্দ্রের মূল্য ধরা হয়েছে ১২ দশমিক ২৫৩ বিলিয়ন ডলার। ভূমি উন্নয়নের জন্য ৫৪৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে। ইতিমধ্যে ব্যয় হওয়া ৫৫১ মিলিয়ন ডলার কেন্দ্রের মূল্যের বাইরে রাখা হয়েছে।

চুক্তি বাস্তবায়নের সময় ধরা হয়েছে সাত বছর। ঋণ পরিশোধের সময় ২৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ বছর গ্রেস পিরিয়ড রয়েছে। ছয় মাসের লাইবরের (লন্ডন ইন্টার ব্যাংক অফার্ড রেট) সঙ্গে ১ দশমিক ৭৫ শতাংশ যোগ করে ঋণের সুদের হার নির্ধারণ করা হবে। তবে কোনোক্রমেই সুদের হার বছরে ৪ শতাংশের বেশি হতে পারবে না।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় গত বছর ৯৫১ শ্রমিক নিহত হয়েছেন
মানবকণ্ঠ, ২ জানুয়ারি, ২০১৫

২০১৫ সালে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৯৫১ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। বাংলাদেশ অকুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন এ জরিপ প্রকাশ করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রাতিষ্ঠানিক খাতের মধ্যে পোশাক শিল্প খাতে নিহত ৭৩ জন (কর্মস্থলে আসা-যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৭ জন নিহত) ও আহত ১১৭ জন, নির্মাণকাজে নিহত ২৬ জন ও আহত ৩৪ জন। এছাড়া জাহাজ-ভাঙ্গা শিল্পে নিহত হয়েছেন ১৪ জন ও আহত ২৭ জন শ্রমিক। বছরের বিভিন্ন সময়ে সিমেন্ট কারখানার ২৬ জন, নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়েছেন ২৪ জন, প্লাস্টিক কারখানায় আগ্নিকাণ্ডে ১২ জন এবং দেশলাই কারখানার ১০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মধ্যে পরিবহন খাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক শ্রমিক হতাহত হয়েছেন (নিহত ৩৪৭ জন এবং আহত হয়েছেন ১৫৫ জন)। পরিবহন শ্রমিকদের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৫৪ জন নিহত এবং ৩৪ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন। এছাড়া দুর্বৃত্তদের হামলায় আহত হয়েছেন আরো ১০৮ জন পরিবহন শ্রমিক। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নির্মাণ সেক্টরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক শ্রমিক হতাহত হয়েছেন। (নিহত ১৪৬ জন ও আহত ৫৫ জন শ্রমিক।) এছাড়া কৃষি কাজে নিয়োজিত অবস্থায় বজ্রপাতের কারণে মৃতের সংখ্যা ৬৮ জন। ৪৭ জন গৃহশ্রমিক, ৪০ জন দিনমজুর; ১৩ জন হকার; ১০ জন মৎস্য শ্রমিক নিহত হয়েছেন।

বিএসএফের গুলিতে চলতি বছর সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশী নিহত
বিবিসি বাংলা, ২২ ডিসেম্বর ২০১৫

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর গুলিতে গত পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশী নিহত হয়েছে বলে বলছে বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থাগুলো। আইন ও সালিশ কেন্দ্র বলছে, চলতি বছরে এপর্যন্ত বিএসএফের গুলিতে ৪৫জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। গতবছর এই সংখ্যা ছিল ৩৩জন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিচালক নুর খান লিটন জানিয়েছেন, এ বছর মারা যাওয়া পয়তাল্লিশজনের মধ্যে ৩১ জন গুলিতে আর ১৪জন শারীরিক নির্যাতনে নিহত হয়েছে।

মানবাধিকার সংস্থা 'অধিকার' বলছে, এ বছর নভেম্বর মাস পর্যন্ত বিএসএফের গুলিতে ৪১জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ৬০জন। আর ২৭ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ অপহরণ করেছে.. ..

অধিকারের হিসাবে, ২০১৩ সালে সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহতের সংখ্যা ছিল ২৯জন। ২০১২ সালে ৩৮জন আর ২০১১ সালে ৩১জন। এর আগে ২০১০ সালে এই সংখ্যা ছিল ৭৪ জন।

মানবাধিকার লংঘনের চিত্র ছিল উদ্বেগজনক
কালের কণ্ঠ, ২ জানুয়ারি, ২০১৬

২০১৪ সালের তুলনায় গত বছর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গণপিটুনিতে হত্যা, মুক্তমনা হত্যা, শিশু হত্যা, রাজনৈতিক সহিংসতা, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ধর্ষণের ঘটনা বেশি ছিল বলে বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ

কেন্দ্রের (আসক) পর্যালোচনায় উঠে এসেছে।

আসকের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত বছর আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ, গুলিবিনিময় ও এনকাউন্টারের নামে নিহত হয়েছে ১৮৩ জন, ২০১৪ সালে নিহত হয় ১২৮ জন। গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে গত বছর ১৩৫ জন, ২০১৪ সালে ১২৩ জন। গত বছর নির্যাতন করে ১৩৩ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, ২০১৪ সালে যা ছিল ৯০ জন। গত বছর ৮১২টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় ১৫১ জন নিহত হয়েছে, এর আগের বছর ৬৬৪টি সহিংসতার ঘটনায় ১৪৭ জন নিহত হয়। গত বছর ৮৪৬ নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়, যেখানে এর আগের বছর ৭০৭ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। এ ছাড়া গত বছর মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার চিত্র ছিল উদ্বেগজনক।

আসকের প্রতিবেদনে বলা হয়, পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ অনুযায়ী গত বছরের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর এই সময়ের মধ্যে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ৫৫ জনকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে পরবর্তী সময়ে আটজনের লাশ পাওয়া গেছে, পাঁচজন ফিরে এসেছেন আর সাতজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যু: আসক বলেছে, গত বছর পুলিশের নির্যাতনে সাতজন, গোয়েন্দা পুলিশের নির্যাতনে এক, র্যাবের নির্যাতনে দুই ও বিজিবির নির্যাতনে একজন মারা গেছে। এ ছাড়া পুলিশের গুলিতে ২৫ জন, গোয়েন্দা পুলিশের গুলিতে এক ও বিজিবির গুলিতে দুজন মারা গেছে। থানা হাজতে আত্মহত্যা করেছে তিনজন, পুলিশ হেফাজতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দুই ও র‍্যাব হেফাজতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। কারা হেফাজতে ৬৯ জন মারা গেছে।

নারী নির্যাতন: ২০১৫ সালে এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে ৩৫ নারী, এর মধ্যে তিনজন মারা গেছে। যৌন হয়রানির শিকার হয়ে ১০ নারী আত্মহত্যা করেছে। যৌন নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পাঁচ নারী ও একজন পুরুষ মারা গেছে। এ ছাড়া ৩০৪ জন নারী-পুরুষ হয়রানি ও লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে। সালিস ও ফতোয়ার মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১২ নারী। যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতনের শিকার হয়েছে ২৯৮ জন। যৌতুকের জন্য শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে ১৮৭ নারীকে আর যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছে ১০ নারী। পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৩৭৩ নারী, এর মধ্যে ২৭৩ জনকে হত্যা করা হয়েছে। নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা করেছে ৫৪ জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৬০ জনকে। এ ছাড়া গত বছর ৬৩ জন গৃহপরিচারিকা বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে শারীরিক নির্যাতনের পর মারা গেছে সাতজন, রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের।

সাংবাদিক হয়রানি: ২০১৫ সালে সারা দেশে ২৪৪ জন সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন, হয়রানি, হুমকি ও পেশাগত কাজ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়েছেন। এর মধ্যে সন্ত্রাসীর হাতে খুন হয়েছেন দুজন। প্রকাশিত সংবাদের জন্য মামলার শিকার হয়েছেন ১০ জন। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে নির্যাতন, হুমকি, হয়রানি বা মামলার শিকার হয়েছেন ১৮ জন। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের হাতে হামলা, হুমকি, নির্যাতন, হয়রানির শিকার হয়েছেন ৪৪ জন আর বিএনপির হাতে দুজন। সিটি ও পৌর নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ভয়ভীতি, হামলা ও বাধার শিকার হয়েছেন ৩৬ জন। প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন ২২ জন।

সীমান্ত সংঘাত: ২০১৫ সালে সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে নিহত হয়েছে ৩২ জন। নির্যাতনে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। এ ছাড়া আহত হয়েছে ৭৩ জন। অপহরণের শিকার হয়েছে ৫৯ জন। অপহরণের পর বিজিবির মধ্যস্থতায় ফিরে এসেছে ৩১ জন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন: গত বছর হিন্দু সম্প্রদায়ের ১০৪টি বাসস্থান ও ছয়টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং ২১৩টি প্রতিমা, পূজামণ্ডপ ও মন্দিরে ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় ৬০ জন আহত হয়েছে।

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্সের প্রতিবেদন:
সংসদ সদস্যদের ৬১% ব্যবসায়ী
বণিক বার্তা, ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৫

১৯৯১ সালে গঠিত পঞ্চম সংসদে সংসদ সদস্য হিসেবে ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ ছিল ৩৮ দশমিক ৪ শতাংশ। এ হার ২০০৯ সালে গঠিত নবম সংসদে এসে দাঁড়িয়েছে ৬১ দশমিক ৩ শতাংশে। মূলত নির্বাচনী ব্যয় বাড়ায় সংসদ সদস্য হিসেবে ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) প্রকাশিত 'দ্য স্টেট অব গভর্ন্যান্স বাংলাদেশ ২০১৪-১৫' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৯৭০ সালে গঠিত প্রথম সংসদে ৩০ শতাংশ আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ গ্রুপ ছিল আইনজীবী। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় সংসদে সংসদ সদস্য হিসেবে আইনজীবীদের হার দাঁড়ায় ২৭ শতাংশে। তবে পঞ্চম সংসদ থেকেই ক্রমাগত ব্যবসায়ীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, পঞ্চম সংসদে সংসদ সদস্য হিসেবে ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ ছিল ৩৮ দশমিক ৪ শতাংশ। সপ্তম সংসদে এ অংশগ্রহণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫২ শতাংশে। পরবর্তীতে অষ্টম সংসদে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। এতে সংসদ সদস্য হিসেবে ৫৭ শতাংশ ব্যবসায়ী ছিলেন। আর নবম সংসদে এসে এ অংশগ্রহণ আরো বেড়ে দাঁড়ায় ৬১ দশমিক ৩ শতাংশে।

খেলাপি ঋণে এশিয়ায় দ্বিতীয় বাংলাদেশ
আমাদের সময়, ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৫

এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে খেলাপি ঋণভারে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত পাকিস্থানের ব্যাংকিং খাত। এরপরই রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান। শীর্ষ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত। খেলাপি ঋণ থেকে বাঁচতে ২৫ বছর আগে উদ্যোগ নিয়েও সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে নন-পারফর্মিং লোন শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

ওই গবেষণা প্রবন্ধে এশিয়ার ১৩ দেশের ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বিগত ৫ বছরের বার্ষিক খেলাপি ঋণের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে এই গবেষণা প্রতিবেদনে। এতে দেখা যায়, পাকিস্থানের ব্যাংকগুলোর সবচেয়ে বেশি ১৩ শতাংশ পর্যন্ত খেলাপি ঋণের হার, পাকিস্থানের পরই বাংলাদেশর অবস্থান। ২০০৯ সালের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৯ দশমিক ২ শতাংশ। পরের বছর নেমে আসে ৭ দশমিক ৩ শতাংশে। ২০১১ সালে খেলাপি ঋণের হার আরও কমে ৬ দশমিক ১ শতাংশে নেমে আসে। কিন্তু ২০১২ সালে খেলাপি ঋণ লাফ দিয়ে বেড়ে হয় ৪৩ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ১০ দশমিক ১ শতাংশ। খেলাপি ঋণের বৃদ্ধি ঠেকাতে নীতি বিশেষ ছাড় দেওয়ায় ২০১২ সালে কিছুটা কমে খেলাপির হার দাঁড়ায় ৮ দশমিক ৯ শতাংশ। ওই বছরে মোট খেলাপি ঋণ হয় ৪৪ হাজার কোটি টাকা। গত ২০১৪ সালে ব্যাপক ছাড় দিলেও বছর শেষে মোট খেলাপি ঋণ হয় ৫০ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৯ দশমিক ৬৯ শতাংশ।

এদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাড়ে ৫৪ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৯ দশমিক ৮৯ শতাংশ।

ওই গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৯০ সালে ব্যাংকিং খাতকে শক্তিশালী করতে নতুন নিয়মকানুন চালু করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, প্রতিনিয়ত খেলাপি ঋণ বাড়ছে। প্রতিবেশী ভারত ও শ্রীলংকার তুলনায় বাংলাদেশের খেলাপি ঋণ অনেক বেশি। বিশেষ করে বাংলাদেশের সরকারি বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত খাতের ব্যাংকগুলোয় খেলাপি ঋণের হার মারাত্মক বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট ঋণের ২২ শতাংশই খেলাপি হয়ে গেছে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর। আর বিশেষায়িত খাতের ব্যাংকগুলোর এই হার ২৫ শতাংশ।